জুমুআর খুতবা

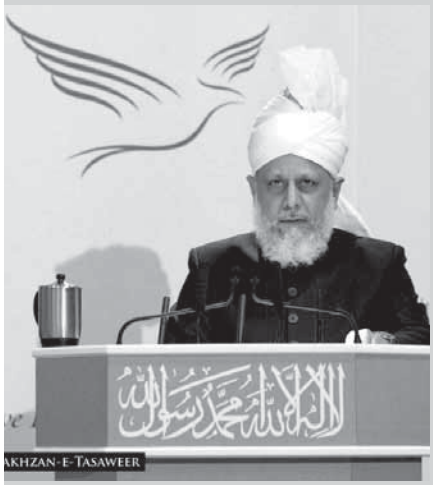

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১লা এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

"শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তার বদনাম করে বেড়িও না বরং নিজের অবস্থার সংশোধন কর। খোদা তাকে পাল্টে দিবেন অথবা তাকেই পুণ্যবান করে দিবেন। যে কষ্ট আসে তা নিজের অভ্যন্তরীণ মন্দ কর্মের কারণে আসে। নতুবা মু'মিনের সাথে খোদার সাহায্য থাকে।

মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং উপকরণের ব্যবস্থা করেন। আমার উপদেশ এটিই তোমরা সকল দিক থেকে পুণ্যের আদর্শ হও। খোদার অধিকারও খর্ব করবে না আর বান্দার অধিকারও খর্ব করবে না।"

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

কয়েক জুমুআ পূর্বে ফেব্রুয়ারীর শেষ জুমুআয় আমি মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়ার তাহরিক করে, আহমদীদের স্বীয় দায়িত্ব বুঝার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমাদের কাছে শক্তি নেই, মাধ্যম নেই যে, আমরা মুসলিম দেশের বাদশাহদের নিকট সরাসরি পরিষ্কার ভাবে আওয়াজ পৌঁছাতে পারি। তাদের বুঝাব যে, আপনারা নিজেদের রাজা হওয়া বা সরকার প্রধান হওয়ার যথার্ত দায়িত্ব পালন করুন। হতে পারে কয়েক জায়গায় কোন মাধ্যমে আওয়াজ পৌঁছে যাবে কিন্তু পরিষ্কার সংবাদ পৌঁছবে কি না এটি জানি না। যাই হোক আমি এটি এ জন্য বলেছিলাম, আহমদী যারা দোয়াতে বিশ্বাস করে তাদের দোয়াতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা এ শাসকদের জ্ঞান দান করুন যেন এই মুসলিম দেশগুলো প্রত্যেক ধরনের পরাজয় ও কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পায়।

তদ্রূপ জনগনের জন্যও সংবাদ ছিল, তারাও যেন নিজের দায়িত্ব সমূহ উপলব্ধি করে আর নিজের দেশ গুলোকে সন্ত্রাসী বা অন্যদের থাবায় দিয়ে না দেয়। যাই হোক এ দেশগুলোতে অবস্থানকারী আহমদীদের আমি পয়গাম দিয়েছিলাম, পুণরায় পয়গাম দিচ্ছি, দোয়ার দিকে দৃষ্টি দেন আর দুই দিকেই যত জ্ঞান তাদের দিতে পারেন দেন।

সন্ত্রাসী কোন বিষয়ের সমাধান নয় আর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। আহমদীদের অধিকাংশ এ পয়গামকে বুঝে নিয়েছিল আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আহমদীরা তো সাধারণত ভাংচুরে অংশ নেয় না। এ জন্য তারা ফাসাদে অংশ নেয়নি এবং যুদ্ধ বিগ্রহেও অংশ নেয়নি। তবে কতক এমনও আছে যাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা বল প্রয়োগকারী আর নিযার্তনকারী সরকারের ভুল পলিসি সমূহে কতটুকু ধৈর্য্য ধারণ করব? আমাদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত? অথবা কতক আফ্রিকান দেশ সমূহের ক্ষমতা প্রত্যাপনে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আইভরিকোষ্টে যেমনটি হচ্ছে, ক্ষমতা প্রত্যাপন হচ্ছে না। অন্য জনগন যে সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তাতে আহমদীদের তাদের সাথে মিশে কি পরিমাণ সাপোর্ট দেয়া উচিত বা সরকার বিরোধী মিছিলে অংশ নেয়া উচিত হবে কি? কেন না কতক শিক্ষিতও আমার পয়গামের মর্ম বুঝেনি আর প্রশ্ন করতে থাকেন। কতক সময় তারা হ্যা নাতে উত্তর চান যে, আমাদের নিকট এটি পরিষ্কার করুন, আমরা কাঠিন্যের সাথে আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশ নিতে পারি কি না? আর কি পরিমাণ নিযার্তনকে আমরা সহ্য করব। এ বিষয়ে যারা আমাদের আরব দেশ সমূহ বা আফ্রিকার আরবী ভাষি দেশসমূহ দেখেন, আরব ডেক্স, তাদের হানী তাহের

সাহেব এর সাথে মিটিং করেছিলাম তাদের অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বিশাদ বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে ছিলাম, এ অবস্থায় একজন আহমদীর কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত? উভয় দিকের ভাল ও মন্দ দিকগুলো কি হবে? এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। অত:পর আমি এটিই বলেছিলাম, এ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে সম্পর্কিত দেশ বা আমাদের যে সকল লোকদের ঐ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আছে তাদের নিকট পৌছে দিন যেন আহমদীগণ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেন। কিন্তু কতক পত্র এবং প্রশ্ন থেকে আমার মনে হয়, কতক জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টি ভঙ্গি যার ভিত্তি কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, সেটি পরিষ্কার বুঝেন নি। সেটিকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এ কারণে আমি কিছু বিষয় একত্রিত করেছি যা আপনাদের সামনে রাখতে চাচ্ছি, যেন প্রত্যেক ধরনের সন্দেহ দূরিভূত হয়ে যায়।

সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হচ্ছে কুরআন করীম। এতেও আমাদের দেখা উচিত, কুরআন করীম শাসকদের সাথে সহযোগিতা এবং আনুগত্য সর্ম্পকে কি নির্দেশ দেয়। অত:পর এটি যে, সাধারণ বিশৃঙ্খলার একজন মুসলমানের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত। নিজের হক আদায়ের জন্য সংগ্রামে কি পরিমাণ তার অংশ নেয়া উচিত। অত:পর হাদীসসমূহ কি বলে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি বলেছেন।

যাই হউক আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

(আন-নাহল:৯১)

আয়াতের এই যে অংশটি রয়েছে, এটি আমরা প্রতি জুমুআ আরবী খুতবাতে পড়ে থাকি, আর এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ধরণের অশ্লীলতা , অপছন্দনিয় বিষয় ও বিদ্রোহীতা থেকে আল্লাহ্ বারণ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'বাগী' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি (আ.) বলেন, 'বাগী' সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যা সীমাতিরিক্ত বর্ষিত হয় আর জমিকে নষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন বাধ্যতা মূলক হক আদায়ে দুর্বলতা প্রদর্শন কে অথবা বাধ্যতামূলক হক আধায়ের আধিক্যও বাগী বলে। (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৪, কম্পিউটারাইজ এডিশন)

তাহলে এটি হচ্ছে কুরআন করীমের সুন্দর শিক্ষা যা প্রত্যেক দিক থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দেশ। এ নিদের্শে এ ধারণা আসতে পারে না যে, এটি এক শ্রেণীর জন্য নির্দেশ আর অন্য শ্রেণীর জন্য নয়। এ আয়াতের পূর্ণাঙ্গীন তফসির তো এ সময় বর্ণনা করছি না, কেবল 'বাগাওয়াত' শব্দের ব্যাখ্যা করছি। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বাধ্যতামূলক হক আদায়ে দুর্বলতা প্রদর্শন কারী বা বাধ্যতামূলক হক আদায়ে আধিক্যকারী উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা বারণ করেন। অর্থাৎ যখন শাসক এবং প্রজাকে নির্দেশ দেয়া হয় তখন উভয়কে নিজেদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। না শাসক নিজের দায়িত্ব আর ক্ষমতায় কম-বেশি করবে, না জনগণ নিজের কর্তব্যে কম-বেশি করবে। যে এমনটি করবে সে আল্লাহ্ তাআলার সীমালংঘন কারী হবে। অথ:পর খোদা তাআলা নিয়মে সীমা লংঘনকারী খোদা তাআলার গ্রেফতারেও আসতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা অত্যাধিক অপছন্দ করেন। সুতরাং বর্তমানে যেহেতু জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের যোশ রাখে তাই আজ কেবল জনগনের সীমারেখা পর্যন্ত আলোচনা করব। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে যাতে শাসকদের ভুল আচরণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে, মু'মিনগণকে ধৈর্য ধারণের নিদের্শ দেয়া হয়েছে।

বুখারী কিতাবুল ফিতন এর একটি অধ্যায়ে আঁ-হযরত (সা.)-এর আনসারদের কে এমন বলা যে, তোমরা আমার পর এমন এমন কাজ দেখবে যা তোমাদের খারাপ লাগবে। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আমের বলেন, আঁ-হযরত (সা.) আনসারদের এটিও বলেছেন, তোমরা ঐ কাজগুলোতে আমার সাথে হাউযে কাউসারে সাক্ষাত পর্যন্ত ধর্য্য ধারণ করতে থাকবে। যায়েদ বিন ওহাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, আঁ-হযরত (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, আমার পর তোমরা দেখবে তোমাদের হক ছিনিয়ে অন্যদের প্রাধান্য দেয়ে হচ্ছে সে সাথে এমন বিষয়ও দেখবে যাকে তোমরা খারাপ মনে করবে। এটি শুনে সাহাবা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি নির্দেশ দেন। তিনি (সা.) বলেন, সেই সময়ের শাসকদের হক আদায় করবে আর তোমরা নিজের হক আল্লাহ্‌র নিকট চাইব। [বুখারী কিতাবুল ফিতান বাব ক্বওলুন্নবী (সা.)]।

অত:পর অন্য এক হাদীসে এসেছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আ-হযরত (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের আমীরের কোন বিষয় অপছন্দ করে তাহলে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত, এ কারণে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আমীরের আনুগত্য থেকে বিঘত পরিমাণ সরে গেলে তার মৃত্যু অজ্ঞতার মৃত্যুর ন্যায় হবে। [বুখারী কিতাবুল ফিতান বাব ক্বওলুন্নবী (সা.), (সাতারুনা বা'দী আমুরান্ তানকারুনাহা হাদীস : ৭০৫২]

অত:পর ওসাহিদ বিন হুযায়ের থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা.)-এর নিকট আসলেন। তিনি বলতে লাগলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে হাকেম নিযুক্ত করেছেন আর আমাকে রাজত্ব দেননি তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার পর এমন দেখবে যে, তোমার উপর অন্যদের প্রধান্য দেয়া হচ্ছে সুতরাং তুমি কিয়ামত দিবসে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে থাক। [বুখারী কিতাবুল ফিতান, বাব ক্বওলুন্নবী (সা.), সাতারুনা বা'দী আমুরান্ তানকারুনাহা হাদীস : ৭০৫৭]।

সালমান বিন ইয়াযিদ আলজা'ফা রাসূল পাক (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের উপর যদি এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা আমাদের নিকট নিজের অধিকার চাইবে কিন্তু আমাদের অধিকার দিবে না তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেন? রাসূলে পাক (সা.) এটির (উত্তর দেয়া) থেকে বিরত থাকেন। তিনি (রা.) পুণরায় নিজের প্রশ্ন পুণরাবৃত্তি করেন, তিনি (সা.) পুণরায় (উত্তর দেয়া থেকে) বিরত থাকেন। তিনি (রা.) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার পুণরায় নিজের প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করেন যাতে আস আ'ছ বিন কায়স তাকে পিছনে টেনে নেন (অর্থাৎ চুপ করানোর চেষ্টা করেন, হুযূর (সা.)-এর এ প্রশ্ন ভাল লাগেনি) তখন রাসূল পাক (সা.) বলেন, এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের শাসকদের কথা শুনবে

আর তাদের আনুগত্য করবে। যে দায়িত্ব তাদের দেয়া হয়েছে সেটির হিসাব তাদের থেকে নেয়া হবে আর যে দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সেটির হিসাব তোমাদের থেকে নেয়া হবে। (মুসলিম, কিতাবুল এমরাতে হাদীস নম্বর : ৪৭৮২)

জুনাদা বিন উমাইয়া বলেন, ওবাদাহ্ বিন সামেত অসুস্থ ছিলেন, তিনি (রা.) তার নিকট গেলেন আর বললেন, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, আমাদের এমন হাদীস শুনান যা আপনি আঁ-হযরত (সা.) থেকে শুনেছেন। এ কারণে আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণে ভূষিত করুন। তিনি (রা.) বলেন, আঁ-হযরত (সা.) আমাদের ডেকে পাঠালেন, আমরা তাঁর নিকট বয়আত করি। তিনি আমাদের সর্ব অবস্থায় কথা শুনা ও মান্য করার বয়আত নেন। হউক তা আনন্দ বা নিরানন্দের, কাঠিন্য বা স্বাচ্ছন্দের আর অধিকার হরনেরও। তিনি (সা.) এটিও অঙ্গীকার নেন যে, যে ব্যক্তি নেতা হয়ে যাবে আমরা তার সাথে জগড়া করব না। কেবল এটি ব্যতিরেকে তোমরা তাকে প্রকাশ্যে কুফর করতে দেখ যার সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দলিল আছে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এমরাত, বাব হাদীস নম্বর : ৪৭৭১)

এ হাদীসগুলোতে আমীর এবং সরকারের না ইনসাফি এবং শরিয়ত বিরোধী কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও তিনি (সা.) বলেছেন, তাদের বিরদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ করার অধিকার নেই। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, শ্লোগান, ভাঙ্গচুর, বিদ্রোহী ভাব অবলম্বনকারীদের কর্মপদ্ধতি শরিয়ত বিরোধী।

এই শেষ হাদীসটির আরো ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, হাদীসের শেষ আংশের আরবী অর্থ আঁ হযরত (সা.) আমাদের থেকে এ অঙ্গীকারও নেন যে, যে ব্যক্তি শাসক হয়ে যাবে আমরা তার সাথে ঝগড়া করব না কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, 'তোমরা তাকে প্রকাশ্যে কুফর করতে দেখ' যার সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলিল আছে।

হাদীসের এ শেষ শব্দগুলোর কতক সালাফী, ওহাবী, অন্য কট্টর ধর্মীয় জামা'ত যারা রয়েছে তারা এ (অর্থ)নিয়ে থাকে যে, সরকারের সাথে লড়াই জায়েয নয় যতক্ষণ 'কুফরে বাওয়া' প্রকাশ্যে প্রকাশ না পায়। যদি শাষক থেকে প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পায় তা হলে তার সংশোধনের জন্য শাসন ক্ষমাতা ছিনিয়ে নেয়া আবশ্যক। এই যে কট্টর পন্থি জামাতগুলো তারা এ দলিলের ভিত্তিতে চিন্তা করে রেখেছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যেতে পারে বরং কতক নিজেদের ফতোয়াকে নিজেদের মাঝে এত দৃঢ় করার চেষ্টা করে যে, অনেক সময় ফতোয়া দান কারীগণ এটি মনে করে যাদের আমরা কাফের আখ্যা দিব তাদের যারা কাফের মনে করবেন না তারাও কাফের। এই যে কাফের আখ্যা দেয়ার প্রবণতা এটি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

যাই হোক হাদীসের মূল শব্দ হ'ল তোমাদের আনুগত্য করতে হবে কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, যদি না এমন কথা বলা হয় যা কুফরের কথা বা তোমাদের কুফরে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে আনুগত্য করা উচিত। কুফরের নির্দেশ দিলেও এমন ক্ষেত্রে বিদ্রোহীতা নয় বরং ঐ কথাটি মানবে না। যাই হোক এ গুলো হচ্ছে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী, আহমদীদের নয়।

হ্যাঁ, যেভাবে আমি বলেছি, কতক পরিস্থিতে কেবল কুফরে বাধ্য করা হলে এতায়েত করা যাবে না যার একটি দৃষ্টান্ত আমরা জামাতে আহমদীয়াতে দেখতে পাই।

পাকিস্তানে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আহমদীদেরকে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের মুসলমান হওয়ার দাবী করবে না। অতএব আমরা এ কথা মানতে রাজী নই, আমরা মুসলমান বলি। আবার বলা হয় তোমরা কলেমা পড়বে না, আমরা কলেমা পড়ি। বা (তারা বলে) পরস্পরকে সালাম দিবে না বা কুরআনে করীম তেলাওয়াত করবে না, এ গুলো আমাদের ধর্মীয় আর দ্বীনের বিষয় এ সর্ম্পকে হাদীস থেকে স্পষ্ট যে এখানে এতায়েত বা আনুগত্যের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেও আমরা বিদ্রোহ করি না। আমরা কখনোও কোন আইনকে কেবল এ বিষয়াদিতে মানতে পারি না, কেন না এগুলো শরিয়তের বিষয় । আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের বিষয়। দেশের অন্যান্য আইনের যতটুকু সম্পর্ক আছে এ আইন সত্ত্বেও প্রত্যেক আহমদী অন্য সকল আইনকে মেনে চলে।

আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির স্বপক্ষে পুরনো ইমামদের একজনের একটি উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল নববী (রহ.) বলেন, 'কুফরে বাওয়া'-এর অর্থ হল প্রকাশ্যে কুফর-এ হাদীসে কুফর শব্দের অর্থ হল পাপ, তিনি আরও বলেন, এ হাদীসের অর্থ হ'ল তোমরা সরকারের বাগডোর যাদের হাতে আছে তাদের ভিতর থেকে ঝগড়া করবে না বা তাদের উপর আপত্তি করবে না। কেবল এটি ব্যাতিরেকে যে, তোমরা তাদের পক্ষ থেকে এমন কোন বিষয় দেখ যা সত্যায়িত ও প্রমাণিত। যার মন্দ হওয়া তোমরা ইসলামী অকিদার আলোকে জান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এমটি যদি দেখ তা হলে তাদের এমন কাজকে ঘৃণা কর। আর যেখানে থাক সেখানে ন্যায় কথা বল, কিন্তু শাসক যালেম ও অত্যাচারি হলেও এমন শাসকদের সাথে বিদ্রোহ করা, তাদের সাথে ঝগড়া করা মুসলমানদের ইজমার দৃষ্টি কোন থেকে হারাম। তিনি লিখেন, হাদীসের যে অর্থ আমি বর্ণনা করেছি সেটিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অন্য হাদীস গুলোও এর সমর্থন করে। আহলে সুন্নত জামাতের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ফিসকের ভিত্তিতে কোন শাসকের অপসারণ সিদ্ধ নয়, আলেমগণ বলেন যে, পাপি অত্যাচারি শাসকদের অপসারণ না করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার কারণ হ'ল এ ক্ষেত্রে নিজেদের আরও বেশি ফেতনা, নৈরাজ্য, খুনা-খুনি, রক্তা-রক্তি সৃষ্টি হবে। তাই যালেম এবং স্বৈরাচারিকে ক্ষমতায় রাখা তাকে অপসারণ করার তুলনায় কম ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হবে। (আলামন হাক্ত বেশারহে সহীহ মুসলিম কিতাবুল আমারাতে, পৃষ্ঠা-১৪৩০, দার ইবনে হাযাম, ২০০২)

আর আজ আমরা দেখছি এ কথা সত্য প্রমানিত হচ্ছে। উভয় পক্ষ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত মানুষ মারা যাচ্ছে, মুসলমান মুসলমানকে হত্য করছে।

অত:পর বুখারীর একটি হাদীসে রাসূল পাক (সা.) বলেন, আল্লাহর নিয়ম নীতিতে দুর্বলতা প্রর্দশন কারী এবং আল্লাহর নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠাকারীর উদাহরণ সেই জাতির ন্যায় যারা নৌকার বিষয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করার ফলে কতক নৌকার উপরের অংশে অবস্থান নেয় আর কতক নৌকার নীচের অংশে। যখন নৌকার নীচের অংশের মানুষ পানি নিয়ে নৌকার উপরের অংশের লোকদের পাশ দিয়ে আসত তখন তারা কষ্ঠ অনুভব করত। যার

কারণে নীচে অবস্থান কারীদের মধ্য থেকে একজন কুড়াল নিয়ে নীচে ছিদ্র করতে লাগল, উপরে অবস্থানকারী তার নিকট আসল আর তাকে জিজ্ঞাসা করল তোমার কি হয়েছে? সে উত্তর দিল, আমার উপরে গিয়ে পানি আনা তোমাদের কষ্ট দেয় অথচ পানি ছাড়া আমার চলা অসম্ভব। সুতরাং যদি উপরে অবস্থান কারী তার হাত ধরে তাহলে তাকেও নিমজ্জিত হওয়া থেকে রাক্ষা করবে আর নিজেদেরকেও ডোবা থেকে রক্ষা করবে। যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়, আর নৌকার নীচের অংশে ছিদ্র করতে দেয় তাহলে তারা তাকেও ধ্বংস করে দিবে আর নিজেদেরও ধ্বংস করে দিবে। (সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদতে, বাবুল কুররাতুফিল্ মুশাকেলাতে হাদীস নম্বর ২৬৮৬)

এ হাদীস থেকে কতক মানুষ এ প্রমাণ দেয় যে, জনসাধারণ মন্দ সম্পাদনকারীদের মন্দ বা ভুল কাজের সংকল্প থেকে বল প্রয়োগে বাধা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এতে নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হবে। অথচ এ থেকে যদি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ নেয়া হয় তাহলে সেটি আঁ হুযূর (সা.)-এর নির্দেশের পরিপন্থি হবে। পূণরায় হাদীসটি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, নৌকার লোকেরা যদি তার হাত ধরে তাহলে তারা তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে আর নিজেদেরও নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে যদি ছেড়ে দেয় তবে নীচে ছিদ্র হলে সে নিজেও ধ্বংস হবে আর তাদেরও ধ্বংস করবে। এ থেকে এই অর্থ নেয়া হয়ে থাকে যে, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, ক্ষতি হয় তা হলে সেটি নিশ্চিহ্ন করার জন্য বল প্রযোগে বিরত রাখা বৈধ, কিন্তু এটি অন্যান্য হাদীস থেকে বিরোধী। এ বিষয়টি সরকার সম্পর্কে নয়। পুণরায় এ মতের সমর্থনে আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপন করা হয় আর সেটির উদ্ধৃতির আলোকে এটি প্রকাশ করা হয় যে, আঁ হযরত (সা.) নিজে কাঠিন্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) এমন কোন কথা বলতেই পারেন না যা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। নিশ্চিত লোকেরা এটি বুঝতে ভুল করেছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ অপছন্দনীয় কোন কাজ দেখবে সে যেন সেটি নিজের হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়, আর যদি এ শক্তি না থাকে তাহলে নিজের মুখ দিয়ে, আর যদি এ শক্তিও না থাকে তাহলে নিজের হৃদয়ে (মন্দ জ্ঞান করে), আর সেটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমান। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর : ১৭৭) এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইমাম আলী কারী লিখেন যার অনুবাদ হচ্ছে, 'আমাদের কতক আলেম বলেন, অপছন্দনীয় কাজকে হাতের দ্বারা পরিবর্তনের নির্দেশ হচ্ছে শাসকদের জন্য, মুখের দ্বারা পরিবর্তন করার নির্দেশ হচ্ছে আলেমদের জন্য, আর হৃদয়ে অপছন্দনীয় কথাকে অপছন্দ করার নির্দেশ হচ্ছে সাধারণ মু'মিনদের জন্য। (মিরকাতুশ শারাহ্, মিশকাত নবম খন্ড, কিতাবুল আদাব হাদীস : ৫১৩৭ পৃষ্ঠা-৩২৪ দ্বারুল কুতুব এলমিয়া দ্বারুত : ২০০১)

সুতরাং এ হলো এ হাদীসের উত্তম ব্যাখ্যা। তিনটি নির্দেশ তো দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর জন্য আর যারা কর্তৃত্বে আছেন তাদের জন্য। সেখানেও নৌকার ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার নির্দেশটি তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা নৌকার যারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিল তাদের জন্য নির্দেশ। প্রত্যেকে যদি এ ভাবে প্রত্যেককে বাধা দেয় তাহলে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। বিশৃংখলা এবং অশান্তির বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২০৬ নং আয়াতে বলেন, 'ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' আল্লাহ্ তাআলা বিশৃংখলাকে পছন্দ করেন না। এ অর্থ যদি করা হয় যে, জনগন সরকারের কোন বিষয় অপছন্দ করলে তাদের সরকারে বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়া উচিত আর ভাংচুর বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, সহিংস আচরণ এবং বিদ্রোহ আরাম্ভ করে দেয়া উচিত তাহলে এ ধারণাও শরিয়তের হেদায়াতের পরিপন্থি। এ সম্পর্কে কুরআনের যে নিদের্শ বা সিদ্ধান্ত তা আমি পূবেই বর্ণনা করে এসেছি। যে, 'ইয়ান্ হা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগীয়ে (সূরা নহল : ৯১)

সমসাময়িক যুগের শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে নবীদের কি আদর্শ ছিল? এক হাদীসে আছে যে পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আগমন করেছেন। কুরআন করীম প্রায় দুই ডজন বা বিশ পচিশ জন নবীগণের ঘটনা বর্ণনা করেছে। (কানজুল আম্মাল, কিতাবুল্ ফযায়েল্, বাবুস্ সানী ফী ফাযায়েলু সযায়েরুল্ আম্বিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৯, হাদীস ৩২২২৭৪) কিন্তু কোন নবী সম্পর্কে কুরআন এ কথা বলেনি যে, জাগতিক বিষয়ে নিজ অঞ্চলের শাসকের বিরুদ্ধে আনুগত্য করেননি বা বিদ্রোহ করেছেন। অথবা তার বিরুদ্ধে নিজ মান্যকারীদের নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বা ভাংচুর করেছেন। ধর্মীয় বিষয়াদিতে সকল নবী নিজ নিজ অঞ্চলে শাসকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহের সরাসরি নাকচ করেছেন আর সঠিক বিশ্বাস সমূহ পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রচার করেছেন। সাধারণত যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয় সেই হযরত ইউসূফ (আ.)-এর দৃষ্টান্তকে নিচ্ছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং যহরত খলীফাতুল মসীহ সানীও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা এর (সূরা ইউসূফের) শুরুতেই বলেন, আমরা তোমার প্রতি এ যে কুরআন ওহী করেছি এর মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যের সবোর্ত্তম অংশ বর্ণনা করছি যার সম্পর্কে পূর্বে তুমি গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। (ইউসূফ:৪)

প্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্য কি যা কুরআন পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সূরা ইউসূফের বেশীর ভাগ অংশ হযরত ইউসূফ (আ.)-এর অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত। এ (জীবনীর) অবস্থার সারাংশ হচ্ছে, হযরত ইউসূফ (আ.) মিসরের কাফের বাদশাহ ফেরআউনের কাবিনায় সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য কোষাগারের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বাদশাহ যদি মনে করত হযরত ইউসূফ (আ.) বিশ্বস্ত নয়, আর নাউযুবিল্লাহ কপটতা মূলক ভাবে আনুগত্য করছেন। তা হলে কখনো নিজ কাবিনায় তাকে অর্ন্তভূক্ত করত না, আর এমনিতে হযরত ইউসূফ (আ.) সম্পর্কে এমন ধারণা করা বে আদবীর অন্তভূর্ক্ত। নাউযুবিল্লাহ হৃদয়ে তিনি মিশরের ফেরআউনের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ রাখতেন কিন্তু বাহ্যত তিনি কপটতা প্রদর্শন করে তার আনুগত্য প্রদর্শন করতেন, তার বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এভাবেই আমরা ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম আল্লাহ্ যদি না চাইতেন তহলে সে তার নিজের ভাইকে বাদশাহের রাজত্ব থেকে (নিজের কাছে) ধরে রাখতে পারত না। (সূরা ইউসুফ) অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) মিশরের বাদশাহ্‌র

আইন অনুসারে তার আপন ভাইকে মিশরে আটকে রাখার অধিকার রাখতেন না। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ পরিকল্পনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভুলিয়ে সরকারী পন্য মাপার বাটখিরা যেটি ছিল সেটি নিজের ভাইয়ের পন্যে রাখিয়ে দিলেন। অনুসন্ধানে তার ভাইয়ের পন্য থেকে সেই পরিমাপ বেরিয়ে আসে। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরের কাফের ও মুশরিক বাদশাহের আইনের অধিনস্ত ছিলেন। জাগতিক বিষয়াদিতে হযরত ইউসুফ (আ.) কাফের বাদশাহের নিয়মের আনুগত্য আর বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য সত্বেও ধর্মীয় বিষয়াদিতে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের অনুসরণ ও আনুগত্য করতেন না।

অত:পর কুরআন করীমের এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম'** এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শাহাদুতুল কুরআনে বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূল এবং নিজেদের বাদশাহ্-এর আনুগত্য কর। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ খন্ড, পৃ: ৩৩২)

অত:পর একদা তিনি বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং শাসকদের আনুগত্য কর, বাদশাহ্-এর আনুগত্য অবলম্বন কর। (আলহাকাম ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১)

অত:পর অন্য এক জায়গায় বলেন, হে মুসলমানগণ! কোন বিষয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হলে সেই বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্ এবং রাসূলের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখ তাহলে এমনটিই কর আর (এটিই) পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৬)

তিনি (আ.) বলেন, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে বিতন্ডা হয় তাহলে সেই বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও রাসূল-এর দিকে প্রত্যার্পণ কর। আল্লাহ্ এবং রাসূলকে বিচারক কর অন্য কাউকে নয়। (আল হক্ব মোবাহেসা দিল্লী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪)।

আর আল্লাহ্ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত যেভাবে পূর্বে আমি বলে এসেছি, সাধারণ জাগতিক অবস্থায় মু'মিনের উপর পরিস্থিতি যা-ই আসুক না কেন তথাপি বিদ্রোহ করবে না। যদি কুফর দেখ বা কুফরের নির্দেশ পাও তা হলে সেক্ষেত্রে আনুগত্য সেই পর্যন্ত যেখানে কুফর ছাড়া অন্য বিষয় রয়েছে এছাড়া আনুগত্য নয় কিন্তু তথাপি বিদ্রোহের অনুমতি নেই।

অন্যত্র এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে নির্দেশ এসেছে, **'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম'**-এখানে 'উলিল আমরে মিনকুম'–এর পরিষ্কার আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। কেউ যদি মনে করে সরকার 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে এটি তার প্রকাশ্য ভ্রান্তি। সরকার যে নির্দেশ শরিয়ত সম্মত দেয় তা 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ যারা আমাদের বিরোধীতা করে না তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের স্পষ্ট ইশারা থেকে প্রমাণিত যে, সরকারের আনুগত্য করা উচিত, আর তার কথা মেনে নেয়া উচিত। (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭১, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

তিনি (আ.) বলেন, শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তার বদনাম করে বেড়িও না বরং নিজের অবস্থার সংশোধন কর। খোদা তাকে পাল্টে দিবেন অথবা তাকেই পুণ্যবান করে দিবেন। যে কষ্ট আসে তা নিজের অভ্যন্তরীণ মন্দ কর্মের কারণে আসে। নতুবা মু'মিনের সাথে খোদার সাহায্য থাকে। মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং উপকরণের ব্যবস্থা করেন। আমার উপদেশ এটিই তোমরা সকল দিক থেকে পুণ্যের আদর্শ হও। খোদার অধিকারও খর্ব করবে না আর বান্দার অধিকারও খর্ব করবে না। (আল হাকাম, ২৪ মে ১৯০১, ১৯ খন্ড, ৫ম পৃ:, ৯ কলাম)

এগুলো হচ্ছে পুণ্যের দৃষ্টান্ত যা আহমদীদেরও প্রতিষ্ঠা করা উচিত বরং আহমদীদেরই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বলতে কেবল মুসলমান শাসক নয়, এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'উলিল আমরে মিনকুম' "কোন কোন মুসলমান ভুলবশত এ আয়াতের এ অর্থ মনে করে যে, এ নির্দেশ কেবল মুসলমান শাসকদের জন্য, তাদের আনুগত্য করা উচিত কিন্তু এ কথা ভুল আর কুরআনের নীতির পরিপন্থী। নি:সন্দেহে যদিও এখানে 'মিনকুম' শব্দ রয়েছে কিন্তু 'মিনকুম' এর অর্থ এটি নয় যে, যারা তোমাদের স্ব ধর্মের অনুসারী এবং এটির অর্থ এই যে, যারা তোমাদের মধ্য হতে শাসক নিযুক্ত হয়। 'মিন' এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের সম্বোধন করে বলেন, **'আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনহুন'** (সূরা আনআম : ১৩১) এ আয়াতে যদি 'মিনকুম'-এর অর্থ স্ব ধর্ম করা হয় তাহলে এটির অর্থ এই হবে যে, 'নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক' রাসূল কুফ্ফারদের স্ব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং আবশ্যক নয় যে 'মিনকুম' স্বধর্মের অর্থেই হবে। এটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ জায়গায় এটির অর্থ এটিই যে, তোমাদের দেশের যারা শাসক (তাদের আনুগত্য কর)। অর্থাৎ এটি নয় যে, যে (স্ব ধর্মের) শাসক হবে তার আনুগত্য করে বরং যারা তোমাদের শাসক হবে তাদের আনুগত্য কর। আর –'ফা ইন্ তানায'তুম ফী শাইয়িন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহে ওয়া রাসূলে' –এর অর্থ এ নয় যে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত করে নাও বরং এটির অর্থ এই যে, যদি শাসকের সাথে বিবাদ হয় তবে সেটিকে খোদা এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর আর সেই নির্দেশ এটিই যে, শাসককে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। যদি সে না মানে তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন আর অত্যাচারিকে তার আচরণের শাস্তি দিবেন।"

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় আমি যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি তিনিও এই দলিল দিচ্ছেন, তিনি বলেন, "কুরআন করীমে যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেটিও প্রমাণ বহন করে যে, শাসক যে কোন ধর্মের হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক। বরং যদি তার নির্দেশ এমন যে শরিয়তের নির্দেশের পরিপন্থী যার সম্পাদন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সে ক্ষেত্রেও আনুগত্য আবশ্যক। যেমন হযরত ইউসুফ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যখন তার ভাইয়েরা তার ছোট ভাইকে তার নিকট নিয়ে আসল তখন তিনি তার ভাইকে সেখানকার বাদশাহ্-এর নিয়ম অনুযায়ী তার নিকট রাখতে পারতেন না এ জন্য খোদা স্বয়ং তার জন্য একটা পরিকল্পনা করলেন তদ্রুপ তিনি সামনে এগিয়ে বলেন, এই আয়াত, 'ইজআ'লীন খাযায়েনেল আরযে' (সূরা ইউসুফ : ৫৬) এর তফসীরে ফাতহুল বয়ানে তফসীর করা হয়েছে, এ আয়াত থেকে এ প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী বা কাফের বাদশাহ্-এর পক্ষ থেকে দেয়া পদ সেই ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করা বৈধ যে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখে যে সে সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। স্মরণ রাখা উচিত, সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থ এ নয় যে, নিজের শরিয়ত চালাতে পারবে। যেমন কিনা ইউসুফ (আ.)-এর ভাই এর বিষয় থেকে বুঝা যায়, কাফেরের চাকুরীর জন্য এ শর্ত নেই যে মু'মিন ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা চালাতে পারবে। সুতরাং সত্যের হিফাযতের অর্থ হল অন্য বিষয়ে শামেল হবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিষয় থেকেও পরিষ্কার যে, সরকার কাফের হলেও তার প্রতি বিশ্বস্ততা আবশ্যক। (আনোয়ারুল উলুম ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯, ২৬০)। শাসকদের মতভেদ হলে কি করা উচিত এ সম্পর্ক আরও ব্যাখ্যা। পূর্বেও বর্ণনা এসেছে যে, শাসক শুধু মুসলমান হলে তাদের আনুগত্য করতে হবে বা এই যে নির্দেশ যা এটি ভয়ের জন্য এসেছে। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) কি বলেছেন? তিনি (সা.) পূববর্তী খলীফাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তোমাদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তথাপি (তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর আর আনুগত্য এবং বধ্যগত হওয়াকে নিজের আচরণ বানিয়ে নাও। আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা মানুষের মধ্যে অনেক বড় মতভেদ দেখবে। সুতরাং এমন সময় তোমাদের জন্য একটিই আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ যে, তোমরা আমার সুন্নত আর আমার পরে আগত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরবে। 'তামাস্‌সাকু বেহা তোমরা এ সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে। যেভাবে কোন জিনিসকে দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরে রাখা হয় সেভাবে ঐ সুন্নতের সাথে চিমটে থাকবে আর কখনো আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীন-এর পথ পরিত্যাগ করবে না। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল-এর হাদীস।

জাগতিক শাসকদের সম্পর্কে শিক্ষা কি? বুখারীর এ হাদীসেই তিনি (সা.) বলেন, "তোমরা আমার পর এমন অবস্থা দেখবে যে, তোমাদের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে" (এটির বর্ণনা পূর্বে এসে গেছে, এটি পার্থিব শাসক যারা আছেন তাদের জন্য) "তোমাদের অধিকার পদ দলিত করা হবে আর অন্যদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। এমন বিষয় তোমাদের চোখে পড়বে যা তোমরা অপছন্দ করবে। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি (সা.) বলেন, এমন শাসকদের প্রাপ্য তাদের দিবে আর নিজের অধিকার আল্লাহ্‌র নিকট চাইবে। [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব কৃওলুন্ নবী (সা.), সাতারুনা বা'দী আমুরান তকব্বারুনাহা হাদীস নম্বর :৭০৫২] মুসলিমেও এর অনুরূপ একটি হাদীসে আছে যার অনুবাদ হচ্ছে, শাসক অনেক অত্যাচারী এবং আত্মসাৎকারী হলেও তার আনুগত্য করবে। সুতরাং অত্যাচারী সরকারের প্রতিও আনুগত্যের হক আদায় করা উচিত। (সহী মুসলিম, কিতাবুল, মাসরত) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না আর তার আনুগত্য অস্বীকার করা যাবে না বরং এমন কষ্ট দূর কার জন্য এবং তার সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করা উচিত।

একজন আহমদীকে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সে কোন শর্ত স্বাপেক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, "মিথ্যা, ব্যাভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যক পাপ, অবাধ্যতা অন্যায় অত্যাচার ও আত্মসাৎ অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন সেটির শিকারে পরিণত হবে না।

আর চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, "উত্তেজনার বশে অন্যায়ভাবে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত: কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কোন কষ্ট দিবে না।" (মজমুয়া ইশতেহারাত প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯ রাবওয়া থেকে মুদ্রিত)

অত:পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কতল' (সূরা বাকারা : ২১৮) বিদ্রোহ ছড়ানো অর্থাৎ শান্তিকে বিঘ্নিত করা, হত্যার চেয়ে বড়। (জঙ্গে মোকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৫৫) তিনি (আ.) বলেন, 'উলিল আমর' বলতে জাগতিকভাবে বাদশাহ্ এবং আধ্যাত্মিক ভাবে যুগ ইমাম। জাগতিক ভাবে যে ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ্যের বিরোধী নয়, তার দ্বারা যদি আমরা ধর্মীয় উপকার পাই (তাহলে) সে আমাদেরই মধ্য হতে" (জরুরতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, ১৩ খন্ড, পৃ: ৪৯০) তিনি (আ.) আরও বলেন, খোদা না করুন যদি এমন কোন স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমাদের কেউ থাকে তবে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, সরকারের প্রথম আনুগত্যকারী যেন তোমরা হউ। অনেক জায়গাতে শুনা গেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে, আমার মতে সরকারের আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া বিদ্রোহ বা ভয়াবহ অপরাধ। হ্যাঁ, নিশ্চিত সরকারের এটি দায়িত্ব যে, তারা এমন অফিসার নিযুক্ত করবে যারা উত্তম স্বভাবের অধিকারী, ভদ্র, দেশীয় রীতি নীতি এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ সম্পর্কে অবগত থাকবে। বস্তুত: তোমরা নিজেরা এই নিয়মগুলো মেনে চল আর নিজেদের বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের এ নিয়মগুলোর উপকার সম্পর্কে অবহিত কর। (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ: ১৩৪ নতুন সংস্করণ)

অত:পর একদা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হরতাল হয়। এটি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "বিশৃঙ্খল ছাত্রদের সঙ্গ অবলম্বন করার যে পদ্ধতি এটি আমাদের শিক্ষা এবং পরামর্শের বিরোধী। এজন্য সে ঐ দিন থেকে বিদ্রোহীর অন্তর্ভুক্ত।"

(অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক আত্মীয় সম্পর্কে এ কথা বলেছেন) অত:পর তিনি (আ.) আরও বলেন, ছাত্ররা যখন লাহোরে নিজেদের প্রফেসরদের বিরোধীতায় ষ্ট্রাইক করেছে তখন যে সমস্ত ছাত্ররা এ জামা'তভুক্ত ছিল তাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন এ বিরোধীতায় অংশ না নেয়। আর নিজেদের শিক্ষকদের নিকট ক্ষমা চেয়ে তৎক্ষণাত কলেজে প্রবেশ করে। তাই তারা আমার নির্দেশ মান্য করে আর নিজেদের কলেজে প্রবেশ করে এমন এক পুণ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যে অন্য ছাত্ররাও তাৎক্ষণিক ডুকে পরেছে।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩ নতুন সংস্করণ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কি? তিনি (রা.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্, রাসূল এবং উলিল আমরের এতায়াত আবশ্যক। উলিল আমর যদি আল্লাহ্ এবং নবীর প্রকাশ্যে নির্দেশের বিরোধীতা করে তাহলে মুসলমান সহ্য ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত এবং স্বত্ত্বগত বিষয়ে উলিল আমরের নির্দেশ মান্য করা উচিত। অথবা তার দেশ ছেড়ে দেয়া উচিত। 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর ওয়া উলিল আমর মিনকুম' কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ.....প্রথম শাসক এবং বাদশাহ্ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলেমও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।" (আল বদর, নম্বর ৮ খন্ড ২৬.৯ ডিসেম্বর ১৯০৯ পৃষ্ঠা-৪, কলাম : ২)

অনেকে এ প্রশ্নও করেন, কাশ্মিরিদের পক্ষে

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হিন্দুস্থানের মুসলমানদের সাথে মিলে যে জলসা এবং মিছিল করেছিলেন, আর এর অনুমতি দিয়েছিলেন তাই মানুষ মনে করে, এই যে পদ্ধতি ছিল, এটিও সেই পদ্ধতি যা আজকালের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে। তাই এ কারণে এটি জায়েজ। অথচ এটি তাদের (কাশ্মিরিদের) অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য বাহিরের একটি আওয়াজ ছিল, মিছিল এবং জলসা ছিল, কোন ঝগড়া, ভাংচুর ছিল না। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে কাশ্মিরিদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে। সেটি আদায় করা হউক। তাদের সম্পত্তি কেবল নামে মাত্র। তাদের সম্পূর্ণ সম্পত্তির আয় রাজার হাতে চলে যায়। সুতরাং তাদের অধিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাদের অধিকার তাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যা হোক ১৯২৯ সনের ২৯ নভেম্বর-এর হরতাল সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আহমদীদের এ ব্যাপারে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? সেই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "হরতালে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, জলসা এবং মিছিলের যতটুকু সম্পর্ক তা ঠিক আছে। কেননা সরকার এক পর্যায় পর্যন্ত এটির অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু হরতাল, দোকান বন্ধ রাখা আর ভাংচুর করা এ বিষয়গুলো সিদ্ধ নয়।

অত:পর "একজন ভদ্রলোক বলেন, শহরে যেহেতু আহমদীদের দোকান অনেক কম থাকে এ জন্য যদি এগুলো খোলা রাখা হয় তাহলে আক্রমণের আশংকা থাকে আর মানুষ লাঠি দ্বারা বন্ধ করিয়ে দেয়।" এতে তিনি (রা.) বলেন, "যদি কেউ লাঠি দ্বারা বন্ধ করিয়ে দেয় তাহলে বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর পুলিশ গিয়ে সংবাদ দেয়া উচিত যে আমরা দোকান খোলতে চাই কিন্তু অমুক ব্যক্তি আমাদের খোলতে দেয় না। পুলিশকে যদি নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় তাহলে খোলে নিতে পারে নতুবা প্রয়োজন নেই।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন আইনগতভাবে কি হরতাল নিষিদ্ধ? হুযূর (রা.) বলেন, "আইনের প্রশ্ন নয়। এমনিতেও এটি একটি বাজে জিনিস, যাতে ক্রেতা এবং দোকানদার উভয়ের ক্ষতি হয়, এখন ২৯ তারিখে যে মুসলমান বাহির থেকে লাহোর বা নিজের নিকটবর্তী শহর সমূহে পন্য ক্রয় করতে যাবে তারা বাধ্য হয়ে হিন্দুদের দোকানেই যাবে। (কেননা মুসলমান হরতাল করেছে) যার কারণে মুসলমানদেরও ক্ষতি হবে। (আল ফযল পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯, ৪৭ নম্বর, ১৭ খন্ড, পৃ: ৬, কলাম-১)

অত:পর একদা তিনি (রা.) আইন ভংগের উপদেশ দাতাদের আমরা কখনো সাহায্য করতে পারি না। "কতক জামা'ত এমন রয়েছে যারা বিদ্রোহের শিক্ষা দেয়, কতক হত্যা এবং রাহাযানির শিক্ষা দেয়, কতক আইনের মান্যতাকে আবশ্যক মনে করে না। এ সমস্ত বিষয়ে কোন জামা'তের সাথে আমাদের সহযোগিতা হতে পারে না। কেননা এটি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী বিষয়। আর ধর্মের অনুসরণ এত জরুরী যে, সমস্ত সরকার যদি আমাদের বিরোধী হয়ে যায় আর যেখানেই কোন আহমদীকে দেখে, তাকে ক্রুশে লটকিয়ে দেয়া আরম্ভ করে, তথাপিও আমাদের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারে না। দেশীয় আইন এবং শরিয়তের আইন যেন কখনোও ভঙ্গ না করা হয়। এ কারণে যদি আমাদের কঠিন কষ্ট দেয়া হয় তথাপি আমাদের জন্য বৈধ নয় যে আমরা এর বিরুদ্ধে চলব।" (আল ফযল, ৬ আগষ্ট ১৯৩৫, ২৩ খন্ড, পৃ: ১০, কলাম-৩)

সুতরাং হরতাল সম্পর্কে সমস্ত নির্দেশাবলী যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ পরিস্কারভাবে সামনে এসে গেছে। আমি পূর্বেও হাদীসের ব্যাখ্যায় সূরা বাকারার ২০৬ নম্বর আয়াতের এক অংশ শুনিয়েছি ওয়াল্লাহু লা 'ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' আল্লাহ্ তাআলা বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না। যখন জোরজবরদস্তি আরম্ভ হয় তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এখন দুর্ভাগ্যবশত এ বিশৃঙ্খল অবস্থায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান দেশগুলো এতে প্রভাবিত হচ্ছে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আয়াত হচ্ছে

وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

আর যখন সে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন সে অশান্তি সৃষ্টি করার আর ক্ষেত খামার ও মানব প্রজন্মকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে দেশময় ছুটে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। (বাকারা : ২০৬)

সরকার যখন অত্যাচারী হয়ে যায় তখন তারা অন্য বিরোধীদের সাহায় সম্পদ, তাদের ফসল, তাদের সন্তান-সন্ততিদের নির্বিচারে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এ সম্পূর্ণ আয়াত শাসকদের সতর্ক করছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার সার্বজনীন নির্দেশও হচ্ছে, 'ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' এজন্য বিদ্রোহকারীদের জন্যও এটিই নির্দেশ।

অতএব আমি যেভাবে শুরুতেই বলেছিলাম যে, কুরআন করীম কেবল সাধারণ জনগণকেই নির্দেশ দেয় না বরং শাসকদেরও এটিই বলে, নিজেদের ক্ষমতার অহংকারে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না। জনগণের অধিকার খর্ব করবে না। ধনী গরীবের পার্থক্য এতটা বৃদ্ধি করবে না যে, সাধারণের ভিতর ব্যাকুলতা দেখা দিবে আর এরই ফলশ্রুতিতে বিদ্রোহ-এর অবস্থা সৃষ্টি হবে। এভাবে তোমরা তোমাদের এ কর্মের কারণেও খোদার নিকট ধৃত হবে।

এখন দেখুন! যে অবস্থা সামনে আসছে বিনা ব্যতিক্রমে সব জায়গায় এ আওয়াজই উচ্চারিত হচ্ছে যে, জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে আর জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কত দুর্ভাগ্য! যে সকল লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে নসিহত করেছিলেন, আর সতর্ক করে ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে সর্বাগ্রে এ মানুষ যারা আজকাল মুসলমান দেশসমূহের শাসক। যারা এ ধরণের অপকর্ম করে যাচ্ছে। জনগণের জানমালের হেফাযত তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের স্বাস্থ্যের দেখাশুনা তদ্রূপভাবে আরও অনেকগুলো দায়িত্ব যা এ সকল সরকারের কাজ, এগুলোর দায়িত্ব পালন করা উচিত। এ দায়িত্বগুলো সম্পাদন না করে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, আর যেভাবে আল্লাহ্ বলেন, বিশৃঙ্খলা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তাই আমাদের শাসকদের আল্লাহ্ তাআলার এ পুরস্কারের মূল্যায়ণ করে এই নিয়ম এবং দৃষ্টান্ত অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা উচিত, যার উদাহরণ আমরা দিয়ে থাকি। হযরত উমর (রা.) রাজ্যে কেমন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? পুণরায় খৃষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছিল মুসলমান পুণরায় আমাদের শাসক হোক। আর এখানে অবস্থা এই যে, মুসলমান প্রজা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। সুতরাং সেই তাক্ওয়া অনুসন্ধান প্রয়োজন যা মুসলমানদের থেকে শেষ হয়ে গেছে, উঠে গেছে। শাসক বা সাধারণ জনগণ উভয়ে এই নীতি অবলম্বন

করলে সফলকাম হবেন। যাই হোক আহমদীদের জন্য পরিস্কার দিকনির্দেশনা যে, নিজেদেরকে এ বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাতে হবে। দোয়া করুন, হৃদয় থেকে উৎসারিত দোয়াগুলো এক সময় আল্লাহ্ চাইলে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে। এ অত্যাচারীদের থেকে, শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে মুক্তিলাভ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সম্মুখেও পরিবর্তনের পর যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে সম্ভবত সাময়িক শান্তি তো হতে পারে তবে স্থায়ী শান্তি আসবে না। এভাবে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয় বা পরিবর্তন আনা হয় তাতে তাদের মধ্যেও এক সময় পর পুণরায় অত্যাচারী না সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। এক অত্যাচারী গত হওয়ার পর আরেক অত্যাচারী এসে যায়। এজন্য দোয়াও করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন কখনও আমাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত না করেন। আল্লাহ্ করুন সাধারণ মুসলমান শাসকগণও নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে বুঝুন। অত:পর সেগুলো আদায়ের চেষ্টা করুন। ইসলামের মনোরম শিক্ষা পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েকটি নামাযে জানাযা গয়েব পড়াব। প্রথম জানাযা মোকাররম সৈয়্যদ আব্দুল হাই শাহ সাহেব, নাযের ইশায়াত, আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ-এর স্ত্রী আমাতুল ওয়াদুদ সাহেবার। দুইদিন পূর্বে হঠাৎ ব্লাড প্রেসার হাই হয়, হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, ব্রেইন হেম্বারেজ হয় আর ২৫ মার্চ সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। শ্রীনগরের অধিবাসী শেখ মাহবুব এলাহী সাহেব যিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন মরহুমা তাঁর মেয়ে। তিনি (শেখ সাহেব) নিজে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে আহমদী হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বের নাম রাধা কৃষ্ণ ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শেখ সাহেবকে কাদিয়ানে এনে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তিনি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত হন।

মরহুমার মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী খাজা আযীয ডার সাহেব পিতা হযরত হাজী উমর ডার সাহেবের মেয়ে ছিলেন। (মরহুমা) অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী পরিবারের ছিলেন তথাপি ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে বিয়ে হলে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করেন। সর্ব অবস্থা সন্তুষ্টির সাথে অতিবাহিত করেন। মিশুক এবং দরিদ্র প্রতিপালনকারিনী ছিলেন। ছয় সাত বছরের একটি মেয়ে পোষ্য নিয়ে লালন-পালন করেছেন, তরবিয়ত করেছেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আর নিজের খরচে তার বিয়েও দিয়েছেন। তিনি আমাদের Humanity First-এর চেয়ারম্যান আহমদ ইয়াহিয়া সাহেবের মা ছিলেন।

দ্বিতীয় জানাযা লাহোরের চৌধুরী মোহাম্মদ শরীফ সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ সাঈদ আশরাফ সাহেবের। তিনি একটি সড়ক পার হওয়ার সময় ২৭ মার্চ দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনজন মোটর সাইকেল চালক তাকে ধাক্কা দেয়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি মরহুম সেখানে পাশে পরে যান আর মোটর সাইকেল তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। যাই হোক ভর করে উঠেন আর অটো রিকশা থামিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে যখন সেখানে ব্যান্ডেজ করেন তখন দশ মিনিটও পার হয়নি শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আর সেখান মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

তাঁর নানা ফযল দ্বীন সাহেব আর নানী হাসান বিবি উভয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততা আর খিলাফতের সাথে অত্যাধিক বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। জামায়াতী কাজে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাঁর এক ছেলে মোহাম্মদ আহসান সাঈদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ, জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি (মৃত্যুর সংবাদ শুনে) যেতে চাচ্ছিলেন তাঁর মা বলেন, ওয়াকফের কর্তব্য এটিই যে, তুমি এখানে এসো না আর নিজের দায়িত্ব পালন কর। দ্বিতীয় জানাযা যা পড়া হবে এটি তাঁর।

তৃতীয় জানাযা নঈমা বেগম সাহেবার, ওয়াহিউ, আমেরিকাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রা.) বিশেষ চিকিৎসক ডাক্তার হাসমত উল্লাহ্ খান সাহেবের (রা.) মেয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় খিলাফত থেকে এখন পর্যন্ত খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বলার প্রেক্ষিতে ইতিহাসে এম,এ করেছিলেন। জামেয়া নূসরাতে কিছু কাল পড়িয়েছিলেন। অত:পর বর্তমানে নিজের ছেলের কাছে আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। এখানেও তিনি লাজনার কাজে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারিনী ছিলেন। আল্লাহ্‌র ফযলে মুসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পদমর্যাদা উন্নত করুন।

পরবর্তী আরো একটি জানাযা নঈম আহমদ ওয়াসিম সাহেবের যিনি ৬ মার্চ আমেরিকাতে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব থানভী (রা.)-এর ছেলে ছিলেন। তিনি (সাহাবী সাহেব) কাদিয়ানে দোয়ার মেশিন নামে পরিচিত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, খোদার উপর ভরসাকারী এবং সিলসিলাহ্-এর জন্য ত্যাগী খাদেম ছিলেন।

জামা'তের প্রত্যেক তাহরীক সমূহে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস, হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের খিলাফতের পূর্বে দ্বিতীয় খিলাফতে কেন্দ্রের হেফাযতের তত্ত্বাবধান তাঁর দায়িত্বে ছিল তখন মরহুম তাঁর সাথেও কাজ করেছিলেন। রাবওয়াহ এর ভিত্তি প্রস্তর রাখার অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি আমেরিকায় চলে যান। আমেরিকাতেও তিনি আনসারুল্লাহ্-এর কায়েদ মাল হিসেবে কাজ করছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হন আর অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েগিয়েছিল। সে সময়ও মসজিদের জন্য আনসারুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল আর চাঁদা একত্রিত করছিলেন তখন জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে প্রশ্ন করেছেন সেটি এই ছিল মসজিদের হিসাব-নিকাশ ঠিক করা হয়ে গিয়েছে কি না? অথবা অমুক অমুক বিল আদায় করে দেয়ার ছিল সেগুলো হয়ে গিয়েছে কি না?

আল্লাহ্ তাআলা সকল মৃতদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের পুণ্যগুলো তাদের বংশধরদের মাঝে জারী রাখুন। জুমুআর নামাযের পর এদের সবার জানাযার নামায হবে।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।